# সংস্কারমুক্তি কিভাবে?

অনন্ত দাস

সিলেট, বাংলাদেশ

*৩১ এ অগাস্ট ডেইলী স্টারে দেখলাম, আমাদের মাননীয় বানিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ঘোষনা দিয়েছেন জ্যোতিষশাস্ত্র নাকি 'হিউম্যান সায়েন্স' (এর মানেটা কি?) আর সরকার নাকি এই বিজ্ঞানের শাখাটির 'উন্নয়নের' জন্য সবকিছুই করবে! মারহাবা, মারহাবা! এবার আর পায় কে! শুরু হয়ে যাবে সাধু, পীর-ফকির, তাবিজ, কবজ-ওয়ালাদের পাশাপাশি যত 'জ্যোতিষ রত্ন', 'জ্যোতিষ রাজ', 'জ্যোতিষ সম্রাট'দের রমরমা রাজত্ব। বাংলাদেশে ১৭ ই আগাস্ট একসাথে প্রায় ৫০০ টা বোমা ফুটল, কোন 'জ্যোতিষ সম্রাট বা জ্যোতিষ বাবাকে দেখলাম না তার আগে নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী করে আমাদের মত ছা-পোষাদের সতর্ক করে দিতে।*

প্রথমে একটি প্রশ্ন দিয়েই শুরু করি, মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীদের পার্থক্য কি? আদৌ কি কোনো পার্থক্য আছে? মানুষ হাত-পা দিয়ে যা করে থাকে, অন্যান্য প্রাণীরা তাদের সামনের পা আর পিছনের পা দিয়ে তা করে থাকে। কোনো কোনো প্রাণী তাদের ঠোঁট দিয়েই হাতের কাজ সেরে ফেলে ; তাহলে আকার আকৃতিগত কিছু পার্থক্য ছাড়া মানুষের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের কি কোনো পার্থক্য আছে? ভাববাদীদের আশরাফুল মাকলুকাত থিওরী এখানে আলোচনার বাইরে। কারণ এই সকল ধোয়াসার ধুম্রজালসৃষ্টিকারী ঠাকুরমার ঝুলির কেচ্ছা-কাহিনীগুলি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট উত্তর দিতে অক্ষম। যাই হোক, শ্রদ্ধেয় পাঠক, আপনারা সবাই জানেন উপরের প্রশ্নের উত্তর কি? হ্যাঁ, আপনারা ঠিকিই ধরেছেন, মানুষের মধ্যে আছে যুক্তিবোধ (Rationality), সে জন্যই মানুষকে বলা হয় 'র‍্যাশনাল বিয়িং'। এই বৈশিস্ট্যটি অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে নাই কিংবা থাকলেও খুবই সীমিত আকারে। চৌদ্দশ গ্রাম (প্রায় ৩ পাউন্ড) ওজনের মস্তিষ্কের দশ হাজার মিলিয়ন কোষের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে মানুষের এই অশেষ ক্ষমতা; যা মানুষকে স্বাতন্ত্রীকরণ করেছে অন্য প্রাণীদের কাছ থেকে। সেই নিয়ানডার্থাল গুহাবাসী থেকে আজকের এই দুহাজার পাঁচ খৃষ্টাব্দের নভোচারী মানুষ ; কতো সহস্র বিবর্তনের ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে, যুক্তিবোধের নিরন্তর চর্চা চালিয়ে আজকের অবস্থানে এসে দাড়িয়েছে। যেদিন থেকে মানুষ প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে, সেদিন থেকে মানুষের এগিয়ে চলার সুত্রপাত। যেদিন থেকে মানুষ সংশয় প্রকাশ করেছে প্রকৃতির খামখেয়ালীপনায়, সেই দিন থেকেই বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু। মানুষের জ্ঞানের সীমা ক্রমেই বেড়ে চলছে। পঞ্চাশ-ষাট হাজার বছরে যা কিছু অর্জন, বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে তার থেকে অনেক অনেক বেশি অর্জন করে চলছে মানুষ। গত শতাব্দীতে আবিষ্কার হয়েছে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার তত্ত্ব ইত্যাদি, যা মানুষের জ্ঞানের পরিধি এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীকে আমুল পাল্টে দিয়েছে। মানুষের হাতে আজ অশেষ ক্ষমতা, আনুবীক্ষনিক একটি কোষ থেকে ক্লোনিং প্রকৃয়ার মাধ্যমে ইচ্ছেমতো প্রাণ সৃষ্টি করে চলছে। ভাইরাস, ব্যকটেরিয়ার প্রতিশেধক হিসেবে এন্টিবায়টিক তৈরী করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছে। মহাবিশ্বে স্টেশন তৈরি করেছে, চাঁদ এখন হাতের মুঠোয়, মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করছে, বিভিন্ন ধরনের দূরবীক্ষণ, উপগ্রহের

সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রগুলোর ঘূর্নন, আভ্যন্তরীন উপাদান, মহাবিশ্বের সৃষ্টি, গঠন কাঠামো নিয়ে গবেষণা করে চলছে। মানুষের ইতিহাস, এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস, বিজয়ের ইতিহাস ; কোথাও কোথাও থেমে যাওয়া আছে ক্ষণিক সময়ের জন্যে, কিন্তু পরাজয়ের কোনো ইতিহাস নেই। এককালে প্রকৃতির করুনার পাত্র মানুষ, আজ প্রকৃতিকেই তাঁর সেবক বানাতে চলছে। কি অবিশ্বাস্য!!

আজকের মানুষের ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্জন আর অগ্রযাত্রার মূল কার্যকরী শক্তি হচ্ছে মানুষের যুক্তিবোধ। মানুষ তথ্য,প্রমান যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পথে এগিয়েছে। যুক্তিবোধের চর্চার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। যদি মানুষের মধ্যে 'কেন' প্রশ্নটির উদ্ভব না ঘটতো, চিন্তার বিকাশ না ঘটতো, তাহলে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মানুষের সাথে গরু, গাধা, কুকুর, বিড়াল, কোঁচো, মাকড়সা, তেলাপোকা ইত্যাদির প্রাণীর পার্থক্য থাকতো না। আজকের মহাকাশচারী মানুষসহ আমজনতা জানে কোনো বড়ো-বাবু এই বিশ্বসংসার চালাচ্ছেন না, বিশ্ব চলছে তার আপন নিয়মে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মেনে, কলেজ পড়ুয়া যে কোনো শিক্ষার্থিই জানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সুশৃঙ্খল পথেই এককোষী জীব থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বহুকোষী জীবের বিকাশ হয়েছে, বিকাশ ঘটেছে মানুষেরও। যাদের সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রয়েছে, তারা জানে আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট হাজার বছর আগের প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ব্যাপারে অজ্ঞ, অসহায় মানুষেরা ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাত, অগ্নুৎপাত, দাবানল, ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা দিতে না পেরে সৃষ্টি করেছিলো অলৌকিক অতিপ্রাকৃত, অপার্থিব শক্তির; এবং মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মৃত্যু পরবর্তী প্রাণ বা আত্মার কল্পনা করেছিলো; স্পষ্টত এই কল্পনার পিছনে কাজ করেছে নিছক স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি। আজকের আধুনিক মানুষেরা যে বিপুল বৈজ্ঞানিক প্রকৃয়ায় সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করতে পারছে, তার সামান্যতম ছিটেফোঁটাও অর্ধলক্ষাধিক বছর আগের নিয়ানডার্থাল মানুষের মধ্যে ছিলো না। আর এই কল্পনাগুলোই পরবর্তীতে পল্লবিত হয়ে ঈশ্বরসহ ও নানা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধারণা ও অনুশাসনাবলীর সৃষ্টি করেছে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে। নিয়ানডার্থাল মানুষদের অজ্ঞতা এবং সীমাবদ্ধতা আর প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞানের সুযোগ না ঘটায় তাদের মধ্যে ভ্রান্ত চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে, কিন্তু সবচেয়ে পীড়াদায়ক হচ্ছে আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই সেই নিয়ানডার্থালদের আদিম সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, ওদের কল্পনাকে সত্য বলে ভেবে বসে আছেন, তার সপক্ষে নানা তত্ত্ব, দর্শন, 'প্রমাণ' ইত্যাদি হাজির করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিজ্ঞান আজ অকল্পনীয় গতিতে এগিয়ে চলছে, তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সেই অর্ধলক্ষাধিক বছর আগে থেকে আজকের খৃষ্টাব্দ দু হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত মানুষ কতটা এগিয়েছে? কতটুকু সংস্কার মুক্তি ঘটেছে মানুষের? কতজন মানুষ আজও যুক্তি দিয়ে মুক্তভাবে চিন্তা করতে পারে? আজও অধিকাংশ মানুষ আত্মা, জীন, ভুত দৈত্য, দানো, হুর, পরী, গেলমান, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, স্বর্গ, নরক প্রভৃতিতে বিশ্বাস রেখে দিন যাপন করে চলছে। কি অদ্ভুত ভাবে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের মেলবন্ধন ঘটিয়ে চলছে! কেউ কেউ বলে থাকেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ধর্ম এমনিতেই বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের কাছে মনে হয় উনারা বোকার স্বর্গে বসবাস করেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাথে ধর্মও তার খোলস পাল্টিয়ে ফুলে ফেঁপে কলা গাছ হয়ে উঠছে। বিলীন হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং উল্টো চিত্রই প্রতিভাত হতে চলছে, যদিও তার সাথে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণও জড়িত। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের মেলবন্ধন ঘটানোর কয়েকটি উদাহরন দিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদেরই বিভাগেরই সম্মানিত শিক্ষক, পেনড্রাইভের সাথে আমলনামা'র মিল খুঁজে পেয়েছেন। উনার বক্তব্য এতটুকু পেনড্রাইভে হাজার হাজার ফাইল জায়গা হতে পারলে, একটি আমলনামার মধ্যে কেন একজন মানুষের সারা জীবনের তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখা যাবে না? শুধু তাই নয়, কমলার খোসা যেমন কমলার কোয়াগুলোকে রক্ষা করে চলছে

কিংবা লিচুর খোসাগুলো লিচুকে রক্ষা করে চলছে তেমনি পর্দাপ্রথা নাকি মেয়েদেরও রক্ষা করে চলছে! কি অদ্ভুত অযৌক্তিক সব কথাবার্তা! এবার আমার জানা একজন নবীন লেখকের কথা বলি। শত শত এরকম লেখক আছেন, জানি। তিনি একটি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সব সদ্য আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য খুঁজে পান। কিছুদিন আগে উনার লিখা একটি বই বাজারে বের হয়েছে। এই মধ্যে তিনি একেবারে প্রমাণ(?) করে ছেড়েছেন উক্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিবর্তনবাদী তথ্য রয়েছে এবং লেখা শেষ করেছেন এরকমভাবে যদি এই লেখা পড়ার পরও যদি কারও অবিশ্বাস থাকে এই ব্যাপারে, তবে তারা গাধা ছাড়া আর কিছু নয়! কি উত্তর হবে এসবের? এবার একজন 'বিজ্ঞানীর' কথা বলি। কানাডা ফেরত ডক্টরেট ডিগ্রিধারী, ভূবিজ্ঞানী হিসেবে কয়েকটি পত্রিকায় সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন। কোথায় দেশে এসে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাবেন তা না, উনার গ্রামের বাড়িতে একটি মসজিদের উন্নয়ন কাজের জন্যে তিনি পচিঁশ লক্ষ টাকা দান করে দিলেন কিছু দিন আগে। কি উত্তর হবে এই সকল কাজের? এই টাকা যদি তাঁর গ্রামের স্কুলটির জন্য বা পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য দিতেন কি এমন ক্ষতি হতো? বিজ্ঞান কি আদৌ উনাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারছে? শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই আজ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে ধর্মবাদীরা রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার মতো জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা দেশেও ধর্মবাদীদের পোয়াবারো! 'বিবর্তনবাদ শুধু একটি অপ্রমানিত তথ্য'-এই কথাটি পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কর্মকর্তারা। আর আমাদের দেশেতো বিবর্তনবাদ পড়ানোই হয় না। এখন আবার শোনা যাচ্ছে নতুন থিওরী 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'। বিজ্ঞানীর ভেকধারী ধর্মবাদীদের কণ্ঠ দিয়ে যে আরও কতো তথ্য বের হয়ে আসবে, তা তারাই জানেন।

আমাদের দেশে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, আমলা, অধ্যাপক, সাংবাদিক থেকে শুরু করে কেরানী, মুদি দোকানদার, রাস্তার ভিখারী পর্যন্ত সবাই কুসংস্কারে বিশ্বাসী। কুসংস্কার আর অপবিশ্বাসে বিশ্বাসীদের অভাব নেই, অভাব আছে শুধু যুক্তিবাদীদের, মুক্তচিন্তার মানুষদের। এদেশের মানুষের অতি ধর্মীয়তা, কুসংস্কার সনাতন অন্ধবিশ্বাস আজও অপরিবর্তিত। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি সবকিছুতেই ধর্মের প্রকোপ। দুদশক ধরে মৌলবাদীদের প্রবল উত্থান আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চাষ হয়েছে। এখন বাম্পার ফলন মিলতেছে। যত্রতত্র পথে ঘাটে, গলির মোড়ে হাটে বাজারে মসজিদ গড়ে উঠছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মন্দিরের সংখ্যা। কিন্তু সেই তুলনায় বাড়ছে কি ভালো স্কুল কিংবা পাবলিক লাইব্রেরী? কিংবা তৈরী হচ্ছে একজন, আহমেদ শরীহ, হুমায়ুন আজাদ কিংবা আরজ আলী মাতুব্বর? এদেশের গণমাধ্যমগুলো শুক্রবার এলেই ইসলামী জগৎ সহ কত ইসলামী নামধারী সংখ্যা বের করতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। খবরের কাগজের অনেকখানি জায়গা দখল করে থাকে জ্যোতিষী আর রাশি ফলের খবরে। টিভি চ্যানেলগুলো 'সত্যের সন্ধান' 'জীবনের আলো' প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিরামহীনভাবে প্রচার করে চলছে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে যদিও হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান প্রচার না করলেও প্রত্যেক শারদীয় দুর্গা পুঁজায় কিংবা কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে পৌরানিক কেচ্ছা কাহিনী প্রচার করে থাকে। জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান 'বাজার' আছে বলেই টিভি চ্যানেলগুলো, পত্রিকাওয়ালাদের মুনাফালোভীদের ব্যবহার করতে পারছে। তাবিজ-কবজ-আংটি পরে ভাগ্যোন্নতির চেষ্টা বিরামহীন ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে অগনিত মানুষ। ওঝা-গুনিনদের পসার কমছে বলে আমাদের মনে হয় না। আমার চেনা একজন ব্যক্তি শ'দুয়েক টাকা খরচ করে একটি ধর্মীয় বই কিনে নিয়ে সেই বই থেকে সুরা কাগজে লিখে তাবিজের মধ্যে ভরে ১০টাকা করে বিক্রি করে চলছেন বছর চারেক ধরে। এখন ধরা পরে ব্যবসা শুরু করেছেন ঠগবাজির টাকা দিয়ে। উনার কাছ থেকেই শুনেছি, এই ব্যবসায় নাকি 'হেভী লাভ'!

এই ধরনের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কেউ কখনো আমাদের দেশে ব্যবস্থা নেয় নি। ভবিষ্যতেও কেউ নিবে কি? মনে তো হয় না। বাংলাদেশের গরুর গাড়ীর চাকা সবসময়ই চলে উলটো দিকে। ৩১ এ অগাস্ট

ডেইলী স্টারে দেখলাম, আমাদের মাননীয় বানিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ঘোষনা দিয়েছেন জ্যোতিষশাস্ত্র নাকি 'হিউম্যান সায়েন্স' (এর মানে টা কি?) আর সরকার নাকি এই বিজ্ঞানের শাখাটির 'উন্নয়নের' জন্য সবকিছুই করবে! মারহাবা, মারহাবা! এবার আর পায় কে! শুরু হয়ে যাবে সাধু, পীর ফকির, তাবিজ, কবজ ওয়ালাদের পাশাপাশি যত 'জ্যোতিষ রত্ন', 'জ্যোতিষ রাজ', 'জ্যোতিষ সম্রাট'দের রমরমা রাজত্ব। বাংলাদেশে ১৭ ই আগাস্ট একসাথে প্রায় ৫০০ টা বোমা ফুটল, কোন 'জ্যোতিষ সম্রাট বা জ্যোতিষ বাবাকে দেখলাম না তার আগে নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী করে আমাদের মত ছা-পোষাদের সতর্ক করে দিতে। ৯/১১ এর আগেও কোন জ্যোতিষী আকাশের তারা গুনেই হোক, আর বুশের হাতের রেখা দেখেই হোক এত বড় ঘটনার কোন রকম আঁচই দিতে পারেননি। জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে সত্যই যদি ভবিষ্যৎ জানা যেত, তবে কোন লটারীতে কোন টিকিট জিতবে, বা রেসে কোন ঘোড়া জিতবে জেনে নিয়ে কোটি কোটি টাকা জিততে পারতেন সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীরা। আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি কোন বিখ্যাত জ্যোতিষবাবা তার 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোন লটারীর টিকেট জিতেছেন। উনাদের আস্ফালন শুধু বড় বড় কথায় আর পত্র-পত্রিকার ঢাউস আকারের বিজ্ঞাপনে!

বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই লোকে বিজ্ঞানমনস্ক হয় না, কিংবা লেখা পড়া শিখে জ্ঞানী গুনি কিংবা ডক্টরেট হলেই মানুষের সংস্কার মুক্তি ঘটে না এ কথা তো আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারও মানুষের সংস্কারমুক্তি ঘটাতে পারে না। তাহলে কিভাবে ঘটবে সংস্কার মুক্তি? কিভাবে দূর হবে অন্ধ আর অপবিশ্বাসগুলি। মানবমুক্তি কিভাবে সম্ভব? আদৌ কি হবে? আমি নিরাশাবাদী নই, হতাশা ছড়াতে পছন্দ করি না। কিন্তু চারিদিকে দেখে শুনে বেশি উচ্চআশাও করতে পারি না। আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, **বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার দরকার। যুক্তিবাদ, মুক্ত-চিন্তা আর বিজ্ঞানমনস্কতাই পারে এই আঁধার কাটিয়ে আলো নিয়ে আসতে।** ভারতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃত শ্রীপ্রবীর ঘোষ একবার একটি রেডিও অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের সবচাইতে নামকরা জ্যোতিষীদের ডেকে এনে তাদের ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ' বেশ কিছু ভালো ভালো কাজ করেছে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে। দেশের বাইরে প্রগতিশীল কিছু বাঙ্গালীদের হাতে গড়ে ওঠা 'মুক্ত-মনা' (www.mukto-mona.com) নামের একটা ওয়েবসাইট জনগণের মধ্যে কুসংস্কার দূর করতে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। এরকম আরো কিছু সংগঠনের এগিয়ে আসা উচিৎ। হাজার বছরের পুরনো তথাকথিত অলৌকিক ধ্যান ধারণা আমাদের কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঢুকে গেছে। একে বের করতে হলে সময় লাগবেই। আরো অনেক রক্ত ঝরবে। যুক্তিবাদ, মুক্তচিন্তা আর বিজ্ঞনামনস্কতার প্রসারের বিকল্প আমাদের কাছে নেই।

সবাইকে শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ।

অনন্ত

০১-০৯-০৫

ইমেইল: **ananta_atheist@yahoo.com**

প্রবন্ধটি দৈনিক ভোরের কাগজের একুশ শতক বিভাগে, সেপটেম্বর ০৫, ২০০৫ তারিখ-এ প্রকাশিত